পশুদের গুরুত্ব ও সংরক্ষণে সুপ্রাচীন ভারতীয় উপলব্ধিঃ একটি অণুচিন্তন

অমিত কুমার সাহা
উইমেন্স কলেজ, বর্ধমান

"ইমা রুদ্রায় তবসে। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্"[১]

বৈদিক ঋষির এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের হার্দিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেখানে রুদ্রদেবতাকে স্তুতি করা হয়েছে যাতে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীরা সুস্থ থাকে এবং গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগমুক্ত হয়। যদিও ঋগ্বেদীয় সমাজে পশুপালন ও পশুহত্যা উভয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণী সরক্ষণের বা পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে বৈদিক যুগে পশুকে সম্পদ বলেই মনে করা হত। কেননা ইন্দ্রের কাছে যজমানের বিভিন্ন পশু প্রার্থনা বিভিন্ন মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।[২] সম্ভবতঃ পশুর প্রাচুর্য থাকার জন্যই হয়ত সরক্ষণের প্রয়োজন হয়নি।

পার্থীব পরিবেশের জৈব উপাদানের অন্যতম অঙ্গ হল পশু। যজ্ঞের নিমিত্ত ও ভোজনের জন্য পশুবধ করা হলেও পশুদের রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা যজুর্বেদেই দেখা যায়। কালের নিরিখে পশুদের সংখ্যা যেই কমতে শুরু হয় সেই তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ঋগ্বেদীয় সমাজে যেটা তেমনভাবে দেখা যায়নি সেটাই ক্রমশঃ দেখা যায় যজুর্বেদে। গাছ, পশু প্রভৃতি ধ্বংস করা যে পাপ এবং সেই পাপ থেকে মুক্তির জন্য যাগের দ্বারা অপরাধের বিনাশ করার প্রচেষ্টা দেখা যায়– "যো বামিন্দ্রবরুণা দ্বিপাৎসু পশুষু স্রামস্তম্ বামে তনাবযজ ইত্যাহৈত্যেবতীর্ব্বা আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ প্রজাঃ পশব উপজীবনায়াস্তা এবাস্মৈ বরুণপাশান্মুঞ্চতি"[৩]। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে প্রভৃতি আরণ্য পশুর এমনকি রাক্ষসদের রক্ষার জন্যও প্রার্থণা অথর্ববেদের ভূমি সূক্তে দেখা যায়।[৪]

মহাভারতে পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হতে দেখা যায়। মহাভারতে অনেক পশুর উল্লেখ আছে। সেগুলির মধ্যে গরু অন্যতম। মহাভারতের যুগে সমাজে গোপালন ছিল অত্যাবশ্যক। বিরাট, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজার গোধনের খ্যাতি ছিল। সেকালের গৃহস্থেরা গরুকে দেবতা রূপে পূজা করত। গোহিংসা এবং গোহত্যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে গণ্য হত। গরুর মাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল। গোহত্যার ঘাতক, গোখাদক এবং গোহত্যার অনুমতি দাতা –সকলেই সেই গরুর যত লোম থাকে তত বছর নরকে নিমগ্ন থাকে[৫]–

"ঘাতকঃ খাদকো বাপি তথা যশ্চানুম্যতে।
যাবন্তি তস্য রোমাণি তাবদ্বর্ষাণি মজ্জতি"।।

Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, (ISSN 2249-3301), Vol. III, 2013. Ed. Pabitra Kumar Mishra. Available online at: http://bcjms.bhattercollege.ac.in, published by Bhatter College, Dantan, Paschim Medinipur, West Bengal, India. www.bhattercollege.ac.in. © Bhatter College, Dantan
**To read or print the article, download Avro Keyboard from www.omicronlab.com/avro-keyboard.html*

এই নিষেধের মধ্য দিয়ে গরুদের রক্ষা এবং প্রাণীজগতের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতে গরু ছাড়াও হাতি, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর নাম পাওয়া যায়। এই সকল পশুকে পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করা হত। পশুদের বিভিন্ন আচরণ থেকে মানুষেরও অনেক সুশিক্ষা নেওয়ার কথা মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে পশুদের আচরণও দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ১৩৪ অধ্যায়ের মার্জার-মূষিক-নকুল-পেচকের উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শত্রুদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে হয়। মহাভারতেই বর্ণিত হয়েছে রাজা শকুনের মত দুরদৃষ্টি-সম্পন্ন, বকের মত স্থির লক্ষ্য, কুকুরের ন্যায় সর্বদা সতর্ক, সিংহের মত বিক্রমশালী, কাকের মত আশঙ্কিত এবং সাপের ন্যায় পরের ছিদ্রান্বেষী হবেন।[৬]

সকল পশুই যখন গুণসম্পন্ন–এবং সেই গুণ যখন মানুষের মঙ্গল বিধান করে, তখন তাদের ধ্বংস করা অনুচিৎ। মহাভারতে পশু হত্যার বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, কুকুর-শূকর-গাধা বধ করলে শুদ্রসম্বন্ধী ব্রত আচরণ করে থাকতে হবে। একটি ক্ষুদ্র প্রাণী হত্যা করলে কেবল অনুতাপই তার প্রায়শ্চিত্ত আর বহু ক্ষুদ্র প্রাণী হত্যা করলে এক বছর ব্রত পালন করতে হবে।[৭] প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মধ্য দিয়ে পশুবধ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করতে চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে বন্যপ্রাণী রক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর দ্বারা যে চেষ্টা করা হচ্ছে মহাভারতের যুগেও সেই প্রচেষ্টা প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল।

পশুহত্যার বিভিন্ন দণ্ডের বিধান পুরাণেও দৃষ্ট হয়। যেমন অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে- অজ, হরিণ প্রভৃতি পশুদের কষ্ট দিলে, রক্তপাত ঘটালে বা তাদের অঙ্গ ছেদন করলে ক্রমশঃ দুই, চার ও ছয় পণ দণ্ড বিহিত হবে। এই সকল পশুদের নিধন করলে মধ্যমসাহম দণ্ড হবে এবং পশুর মালিককে মূল্য দিতে হবে। গরু, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি পশুর প্রতি একই অপরাধের জন্য পূর্বের উল্লিখিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হবে [৮]–

“দুঃখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গচ্ছেদনে তথা।
দণ্ডঃ ক্ষুদ্রপশূনাং স্যাদ্দ্বিপণপ্রভৃতিঃ ক্রমাৎ।।
লিঙ্গস্য ছেদনে মৃতৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ।
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণা দমাঃ”।।

কূর্মপুরাণে বিভিন্ন পশুর হত্যাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি হল- সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, শূকর, শিয়াল, বাঁদর ও গাধা। এছাড়া অন্য সমস্ত গ্রাম্য বা বন্য পশু ও পাখী সবেরই বধ ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৯] বায়ুপুরাণে পরিবেশের জৈব উপাদান প্রাণীদের রক্ষায় অহিংসার মন্ত্র প্রচারিত হতে দেখা যায়।

সকল প্রাণীই যেহেতু ঈশ্বরের সৃষ্টি তাই যেকোন প্রাণী হত্যাই অনুচিৎ-এটা মনু মনে করেন। তাঁর মতে বিপদের সময় বাদ দিয়ে অন্য যেকোন সময়ে যাতে কোন প্রাণীর অল্পমাত্রও অনিষ্ট না হয় বা যতটা পীড়ন না করলে নয়–এভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উচিৎ[১০]-

“অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেন বা পুনঃ।

যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি"।।

আচার্য মনু প্রয়োজনে প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার কথা বলেছেন, কারণ কৃষিকাজ বা রথ পরিবহনের সময় গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশুদের কষ্ট দিতেই হয়। কিন্তু তাদের বধ করে জীবন ধারণ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্যের বিনাশের কথা মনু বলেন নি। উপরন্তু গাধা। ঘোড়া, মহিষ, উট, হাতি, ছাগ, প্রভৃতি বধের নিষেধের কথা বলেছেন। এই সকল প্রাণী হত্যাকারীদের সঙ্করীকরণ হয়।[১১] এছাড়া বিড়াল, নেউল, ব্যাঙ, কুকুর, গোসাপ, পেঁচা, কাক প্রভৃতিকে কেউ যদি জ্ঞানত হত্যা করে তাহলে শুদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করার বিধানও মনু কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য মনু যে সকল পশু-পাখীদের বধ নিষিদ্ধ বলেছেন[১২] সেগুলির মধ্যে গোসাপ, বাজ, তিতির, শুক, ক্রৌঞ্চ বিরল প্রজাতির প্রাণী। বর্তমানে আইন করে বিরল প্রজাতির প্রাণীদের রক্ষা করার যে প্রচেষ্টা দেখা যায় ঋষির সত্যসন্ধ মনে তার সূচনা হয় অনেক যুগ আগেই।

মহামতি কৌটিল্যের মতে পশুসম্পদ ধনাগমেরও উৎস। অর্থসংগ্রহে এই পশুসম্পদকে 'ব্রজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে–"গোমহিষমজাবিকং খরোষ্ট্রমশ্বাশ্বতরাশ্চ ব্রজঃ"[১৩] অর্থাৎ গরু, মহিষ, অজ, মেষ, গাধা, উট, ঘোড়া এবং অশ্বতর –এগুলিকে একত্রে 'ব্রজ' বলা হয়। এই সমস্ত পশু গৃহপালিত ছিল, কেননা এই পশুগুলি দুগ্ধ ও পরিবহনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হত। এই সকল পশু সংরক্ষণের কথা অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। মাছ, হরিণ প্রভৃতির রক্ষার জন্য কৌটিল্য যে 'সূনাধ্যক্ষ' পদের কথা বলেছেন তা বর্তমানের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ-মহানির্দেশক পদের সঙ্গে তুলনীয়। যে সকল পশু-পাখী রাজার নির্দেশে অবধ্য বলে ঘোষিত হয়েছে বা অভয়ারণ্যের পশু-পাখীদের যারা বন্ধন, আঘাত ও হত্যা করবে তাদের সূনাধ্যক্ষ সর্বোচ্চ শাস্তি দেবেন–"সূনাধ্যক্ষঃ প্রদিষ্টাভয়ানামভয়বনবাসিনাং চ মৃগপশুপক্ষিমৎস্যানাং বন্ধবধহিংসায়ামুত্তমং দণ্ডং কারয়েৎ"[১৪] যে সমস্ত প্রাণী অবধ্য বা রক্ষণীয় তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা কৌটিল্য দিয়েছেন[১৫]। হস্তি সংরক্ষণের বিষয়ে হস্ত্যধ্যক্ষ নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। হস্তি হত্যা একান্তভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি হাতিকে হত্যাকারীকে বধের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে–"হস্তিঘাতিনং হন্যুঃ"। পরিবেশ সচেতক কৌটিল্য এটাও বলেছেন যে, অভয়ারণ্যের কোন হরিণ, বন্যপশু বা মাছ ক্ষতিকারক হয় তাহলে তাদের অভয়ারণ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে বধ, বন্ধন প্রভৃতি করা যাবে[১৬]–

"দুষ্টাঃ পশুমৃগব্যালা মৎস্যাশ্চাভয়চারিণঃ।
অন্যত্র গুপ্তিস্থানেভ্যো বধবন্ধমবাপ্নুয়ুঃ"।।

তবে শস্য ভক্ষণকারী পশুদের বিতাড়নের নির্দেশই আছে, সেই পশুকে আহত বা বিক্ষত করলে দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে।[১৭] ছোট পশুদের লাঠি দিয়ে আঘাত করলে এক পণ বা দুই পণ জরিমানা দিতে হবে। আবার আঘাতের ফলে যদি রক্তপাত হয় তাহলে সেই দণ্ড দ্বিগুণ হবে। গরু প্রভৃতি বড় পশুদের প্রতি ঐ একই রকম অপরাধ করলে ছোট পশুর ক্ষেত্রে বিহিত শাস্তির দ্বিগুণ দণ্ড হবে।[১৮] কৌটিল্যের পশু-পাখী হত্যার নিষিদ্ধকরণ এবং দণ্ডবিধান আধুনিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রাচীনতর রূপ।

বৈদিক যুগের যজ্ঞের পশুবধের সমর্থন পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে, হিংস্র প্রাণীকেও যে হত্যা করে সে নিষ্ঠুর এবং সে ভয়ঙ্কর নরকে যায়[১৯]–

"হিংসাকান্যপি ভূতানি যো হিনস্তি স নির্ঘৃণঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং কিং পুনর্যঃ শুভানি চ"।।

পশুবধ সম্বন্ধীয় অপর এক মত পঞ্চতন্ত্রে প্রদত্ত হয়েছে। পশুবধের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, যে সকল যাজ্ঞিক যজ্ঞে পশুবধ করে তারা মূর্খ, তারা শ্রুতিবাক্য ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারে নি। শ্রুতিতে বলা হয়েছে অজের দ্বারা যজ্ঞ করার কথা। সেখানে আসলে 'অজ' বলতে বোঝায় সাত বছরের পুরাতন ধান, কোন পশুবিশেষ বা ছাগল নয়[২০]–"এতেঽপি যে যাজ্ঞিকাঃ যজ্ঞকর্মণি পশূন্ ব্যাপাদয়ন্তি তে মূর্খাঃ পরমার্থং শ্রুতের্ন জানন্তি। তত্র কিলৈতদুক্তম্ অজৈর্যষ্টব্যম্ ইতি অজা বীহয়স্তাবৎ সপ্তবার্ষিকঃ কথ্যন্তে। ন পুনঃ পশুবিশেষাঃ"।

পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষত কালিদাসের রচনায় প্রকৃতিবর্ণনের সাথে সাথে পশু প্রভৃতি পরিবেশের উপাদান গুলির রক্ষার প্রয়াস দেখা যায়। প্রকৃতির কবি কালিদাস তাঁর অনন্তযৌবনা কাব্যসুন্দরী 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে মানব চরিত্রের সঙ্গে উদ্ভিদ তথা মনুষ্যেতর প্রাণীদের সৌহার্দ্যকে স্বমহিমায় বর্ণনা করেছেন। মানুষ ও পশুপাখীর মধ্যে এক অদৃশ্য মেলবন্ধন দেখা যায়, যখন নাটকের শুরুতেই বৈখানস মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্তকে পশুহত্যা করতে নিষেধ করেন[২১]–

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলারাশাবিবাগ্নিঃ"।।

এই নিষেধ আসলে পরিবেশের প্রাণীরক্ষায় সচেতন ঋষিকুমারের নিষেধ। এই সচেতনতা রাজার মধ্যেও জাগরিত হয়। ফলতঃ এক সময় দেখা যায় মৃগয়ার সব উপকরণ ঠিক হয়ে গেলেও রাজা সেনাপতিকে মৃগয়া বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন[২২]। এই নির্দেশ কালিদাস রাজার মুখ থেকে দিয়েছেন। কারণ রাজার আদেশ সকল প্রজাই মেনে চলে। আর রাজা নিজে যদি পশুবধ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন তাহলে অন্য সকলে তা থেকে শিক্ষা নেবে। এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কালিদাসের দুষ্যন্ত এই স্থলে 'বাঁচ' এবং 'বাঁচতে দাও'–এই মনোভাবের পক্ষপাতী। আবার ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায় মহাকবি কালিদাস খাদ্য-খাদক সম্পর্ককেও মেনে নিয়েছেন। সেখানে পশুহত্যার অপরাধ নেই। নাটকের সপ্তম অঙ্কে সিংহশিশুর সঙ্গে দুষ্যন্তপুত্র সর্বদমনের ক্রীড়ারত অবস্থার বর্ণনার মধ্য দিয়ে কালিদাস বোঝাতে চেয়েছেন হিংস্র পশুমাত্রই ক্ষতিকারক বা বধ্য নয়।

কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যেও পশু সচেতনতার বর্ণনা আছে। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন গাভী নন্দিনীকে রক্ষার জন্য রাজা দিলীপ নিজের দেহ দান করতেও প্রস্তুত। তিনি এখানে জীবের রক্ষাকর্তা[২৩]–

"কিমপ্যহিংস্যস্তব চেন্মতোঽহম্
যশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ"।

নবমসর্গে মহারাজ দশরথের মৃগয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু মহারাজ মৃগয়া করতে গিয়ে কখন কখন পশু হত্যা থেকে বিরতও থেকেছেন। যেমন দশরথ একটি হরিণকে বধ করতে উদ্যত হলে তার

প্রাণ রক্ষার জন্য যখন এক হরিণী তাকে আড়াল করে তখন রাজার প্রেমময় সত্তার প্রকাশ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ধনুর গুণ শিথিল করে বাণ সংবরণ করেন[২৪]।

বৌদ্ধযুগে পরিবেশের পশুপাখীদের রক্ষা বিষয়ে অধিক সচেতনতা দেখা যায়। কারণ ভগবান বুদ্ধের অহিংসার বাণী তখন জনসাধারণের মনে বিশেষ স্থান অধিকার করে। বুদ্ধের ভক্ত কবি অশ্বঘোষের রচনা থেকে পশু- সচেতনতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মের প্রভাবে যারা প্রাণি হত্যা করে জীবিকা নির্বাহ করত, তারাও কোন জীবিত প্রাণীকে ক্ষুদ্র হলেও আঘাত করত না। আর যারা অভিজাত, বহুগুণসম্পন্ন, দয়াশীল তাদের মনে সর্বদা অহিংসা ভাব থাকায় পশুহত্যা তাদের ভাবনার অতীত[২৫]–

"ন জিহিংস সূক্ষ্মমপি জন্তুমপি পরবধোপজীবনঃ।
কিংবত বিপুলগুণঃ কুলজঃ সদয়ঃ সদা কিমু মুনেরুপাসয়া"।।

বুদ্ধের এই মৈত্রী ও অহিংসার বাণী পরিবেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বাণী অশ্বঘোষ রচিত সৌন্দরনন্দে বহুল ভাবে ধ্বনিত হয়েছে। নন্দের প্রতি উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছে[২৬]–

"তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু মৈত্রীং কারুণ্যমেব চ।
ন ব্যপাদং বিহিংসা বা বিকল্পয়িতুমর্হসি"।।

সকল জীবের প্রতি তুমি মৈত্রী ও করুণার বৃত্তি অনুশীলন করবে। পরিবর্তে জিঘাংসা যেন মনে স্থান না পায়। দ্বেষাত্মক চিত্তকে প্রশমিত করার জন্য মৈত্রীর প্রয়োজন–"দ্বেষাত্মনো প্রশমায় হি মৈত্রী"। এইভাবে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণীর মাধ্যমে পশু প্রভৃতি নিরপরাধ প্রাণীদের রক্ষার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

কালের গতিতে পশুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকলে বন্যপ্রাণী তথা পশু সংরক্ষণের তাগিদ দেখা যায়। ফলে ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য মহানির্দেশক, সহকারী নির্দেশক এবং অন্যান্য আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে–যা কৌটিল্য অনেক পূর্বে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে নবম ধারায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ তফশীলে উল্লিখিত সমস্ত বন্যপ্রাণীর শিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে আত্মরক্ষা, পড়াশুনা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই নিয়ম ১১ ও ১২ নং ধারায় শিথিল করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২- এর ১৯৯১ সালের সংযোজনী অনুসারে এই আইন লঙ্ঘনকারীর কঠোর শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের পশু রক্ষার ভাবনার সঙ্গে পরবর্তীকালের এই আইনের বহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলির কিয়দংশ আলোচনা করা হল। এবিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা আছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. ঋগ্বেদ- ১/ ১১৪/ ১

২. ঐ - ১/ ৯/ ৭

ঐ - ১/ ১৬২/ ৩

ঐ -১/ ৪/ ১

ঐ -৮/ ৪৬/ ২৮

ঐ -৮/ ৫৬/ ৩

৩. কৃষ্ণযজুর্বেদ- ২/ ৩/ ২৩

৪. অথর্ববেদ- ১২/ ১/ ১/ ৪৯

৫. মহাভারত- অনুশাসন পর্ব/ ৫৯/ ৬৬

৬. ঐ -শান্তি পর্ব/ ১৩৬/ ৬২

৭. ঐ -শান্তি পর্ব/ ১৬০/ ৫৪- ৫৬

৮. অগ্নিপুরাণ- ২৫৮/ ২৩- ২৪

৯. কূর্মপুরাণ- উপরিভাগ/ ১৭/ ৩৪- ৩৫

১০. মনুসংহিতা- ৪/ ২

১১. ঐ -১১/ ৬৯

১২. ঐ -১১/ ১৩৫- ১৩৬

১৩. অর্থসংগ্রহ- ২/ ৬/ ৭

১৪. ঐ -২/ ২৬/ ১

১৫. ঐ -২/ ২৬/ ৬

১৬. ঐ -২/ ২৬/ ১৪

১৭. ঐ -৩/ ১০/ ৩০- ৩৩

১৮. ঐ -৩/ ১৯/ ২৬- ২৭

১৯. পঞ্চতন্ত্র- ৩য় ভাগ/ ১০৪

২০. ঐ -৩য় ভাগ/ গল্পসংখ্যা ২

২১. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্- ১/ ১০

২২. ঐ -২/ ৬

২৩. রঘুবংশম্- ২/ ৫৭

২৪. ঐ -৯/ ৫৭

২৫. সৌন্দরনন্দ- ৩/ ৩০

২৬. ঐ -১৫/ ১৭

অমিত কুমার সাহা, অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, এম.ইউ.সি. উইমেন্স কলেজ, বর্ধমান।
Email ID: amit.burd@gmail.com